কেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র

অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীসমাজের মুক্তি
আসবে কেবল একটি গণতান্ত্রিক,
সেক্যুলার ও শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন
সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র
Bangladesh Women's Liberation Centre

কেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র

'নারীর অধিকার মানবাধিকার' বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগে এবং সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের এই স্তরে এসে এই কথাটি এভাবে উচ্চারিত হওয়ার কথা ছিল না। 'নারীর অধিকার' আর 'মানবাধিকার' সমার্থক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় এই দু'টি শব্দের মধ্যকার দূরত্ব ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে এখন যেন তা বৈপরীত্য নিয়ে অবস্থান করছে। উগ্র মৌলবাদীদের কাছে তো বটেই সমগ্র সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মনন কাঠামোয় নারীর অধিকারের বিষয়টি একেবারেই গুরুত্ববহ নয়।

সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের শিক্ষা থেকে আমরা জানি যে, নারী আজ যেমন পুরুষের অধীনস্থ ও ক্রীড়ানক, সকল সময়ে নারীর অবস্থা এমন ছিল না। একটা সময় ছিল যখন সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ মাকে কেন্দ্র করে সমাজের সুসংবদ্ধতা রক্ষা পেত। প্রাকৃতিক নিয়মেই সেদিন সমাজ মাতৃশাসিত ছিল। নারীই ছিলেন গোষ্ঠীপ্রধান। মায়ের পরিচয় নিয়ে সমাজ চলছিল। মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে দীর্ঘ সময় ধরে সমাজ ছিল মাতৃশাসিত। কৃষি আসার পর স্থায়ী সম্পত্তির সৃষ্টি হল। স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি এবং সন্তান গর্ভে ধারণ ও লালন-পালনের জন্যে কৃষি উৎপাদনে নারীর সমপরিমাণ শ্রমপ্রদানের সীমাবদ্ধতার কারণে পুরুষ নারীর উপর তার আধিপত্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করতে পারল। কাজেই স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি, তাকে কেন্দ্র করে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়া এবং সম্পদের মালিকানা ও তার নিরঙ্কুশ উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হল। সেদিন নারীসমাজ পুরুষের এই আধিপত্য সহজে মেনে নেয়নি। লড়াই করেছিল, রক্ত ঝরিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নারী পরাজয় মানতে বাধ্য হল এবং পুরুষের তৈরি অনুশাসন নারীকে তার উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য করল।

সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার পর নারীর জন্য যে দাসত্বের শৃঙ্খল রচিত হয়েছিল তা আজও পর্যন্ত বিভিন্নরূপে বজায় রয়েছে। পাশ্চাত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার শ্লোগান যেমন উঠেছিল তেমনি নারীস্বাধীনতা, নারী-পুরুষের সমঅধিকার, নারীমুক্তির প্রশ্ন সামনে উঠে এসেছিল। পাশ্চাত্যের এই রেনেসাঁ আন্দোলনের ঢেউ ব্রিটিশ ভারতেও পড়েছিল। ব্রিটিশ ভারতে নারীর উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লড়াই করেছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রেনেসাঁ আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টারা। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রচলনের পাশাপাশি নারীশিক্ষা বিস্তার ও বিধবা বিবাহের

প্রচলন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল তাঁদের রচনায় নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন – তাকে নানা রূপে-রসে-বর্ণে ছটায় উদ্ভাসিত করেছেন। নারী জাগৃতি আন্দোলনের পথিকৃৎ মহিয়সী বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। আর এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সমাজে নানাভাবে নিগৃহিত হয়েছেন, বহু অপমান সহ্য করেছেন। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিকন্যা বীরকন্যা প্রীতিলতা প্রত্যক্ষ সমরে আত্মাহুতি দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন, দেশজননীর মুক্তিসংগ্রামে ভাইদের পাশাপাশি বোনেরাও বুকের রক্ত দিতে পারেন। এরপর বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাস আর পরবর্তীতে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে নারীর গৌরবোজ্জ্বল অংশগ্রহণ পায়ে পায়ে যে পথ রচনা করেছে তা থেকে বাংলাদেশের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীসমাজের পিছিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই – মানুষের মতো মানুষ হিসাবে বাঁচার প্রয়োজনে তাদের সামনে এগিয়ে যেতেই হবে।

বাংলাদেশের নারীসমাজ '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন ও '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধসহ প্রতিটি আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু নারীর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এদেশে কোনো নারী আন্দোলন দানা বাধতে পারেনি। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা স্বাধীন দেশে বাঙালির অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা কাজসহ তার প্রাণের দাবি যেমন অপূরিত রয়ে গেছে তেমনি নারীমুক্তি এবং নারী অধিকারের প্রশ্নটিও উপেক্ষিত রয়েছে। কারণ ক্ষয়িষ্ণু এই পশ্চাৎপদ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নারী দ্বৈত শোষণের শিকার। একদিকে অর্থনৈতিক শোষণ, অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার নিপীড়ন নারীর জীবনকে বিপর্যস্ত করছে। ফলে নারীর উপর অন্যায়-অত্যাচার-নির্যাতন বাড়তে বাড়তে এখন তা সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। শিশু-কিশোর-তরুণ-বৃদ্ধা সকল বয়সের নারীরাই পাশবিকভাবে যৌন নির্যাতনের বলি হচ্ছে। সমাজের পুরুষ নামধারী একটা অংশের মানুষ যেন ক্রমাগত পশুর স্তরে নেমে যাচ্ছে। পাড়া-মহল্লায় বখাটেদের বর্বর লাঞ্ছনার শিকার হয়ে কোমল মনের কিশোরী-তরুণীরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে, তাদের পড়ালেখার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সর্বনাশা মাদক, পর্নো, ভিডিও গেমস্, ইন্টারনেট-টেলিভিশন-পত্রপত্রিকা-চলচ্চিত্রে অশ্লীল ছবি ও বিজ্ঞাপন তরুণ সমাজের নৈতিকতায় ধস নামিয়ে দিচ্ছে। মধ্যযুগীয় কায়দায় শত শত নারী যৌতুক আর ফতোয়ার বলি হচ্ছে।

নারীরা যে কত সহজ আক্রমণের লক্ষ্য তা বোঝা যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাহাড়ি-বাঙালি বিরোধ, যুদ্ধ-মঙ্গা-দুর্ভিক্ষ ও সম্পত্তির

কোন্দল প্রভৃতি সময়গুলোতে। নারীরা সেসময়ে ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়। নারীর উপর এহেন সহিংসতায় প্রাণে বাঁচাই দায়। কোথায় রয়েছে নারীর মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠার প্রশ্নটি ? যদিও বহু নারীই আজ বিজ্ঞানী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, স্থপতি, বিচারপতি, আইনজীবী, রাজনীতিক, শিক্ষক, সরকারি-বেসরকারি পদস্থ কর্মকর্তা, বৈমানিক, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। আবার শিল্প কারখানা ও কৃষিকর্মেও বহু নারীর নীতিনিষ্ঠ অবদান পুরুষের প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু যতবড় শিক্ষিত অথবা যত নীতিনিষ্ঠ কর্মীই হোন না কেন তিনি নিগৃহিত – কারণ তিনি নারী। রাষ্ট্রীয় আইনেও নারী বৈষম্যের শিকার। সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও পারিবারিক আইনেও নারীর অধিকার উপেক্ষিত। সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশে নারীর অবদান ও আত্মত্যাগকে ভুলিয়ে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশে ৮০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সিংহভাগ গার্মেন্ট শ্রমিকই নারী। কিন্তু কি মানবেতর জীবন তাদের! নূন্যতম মজুরি, শ্রমঘন্টা, নিয়োগপত্র, কর্মপরিবেশ, মাতৃত্বকালীন ছুটি কোনোটিরই নেই নিশ্চয়তা। ২০ লাখের বেশি শিশু-কিশোরী, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারী গৃহপরিচারিকা পেশায় নিয়োজিত অথচ শ্রমিক হিসাবে তাদের স্বীকৃতি নেই। গৃহস্থালীর ৯০ শতাংশ কাজ নারীরাই করে। অথচ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক নেই তার স্বীকৃতি। কৃষিকাজে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকা অপরিহার্য। কৃষি শ্রমিক হিসাবে শ্রম দেয়া থেকে শুরু করে, গৃহস্থলে বীজ সংরক্ষণ, মাড়াই-ঝাড়াইসহ প্রক্রিয়াজাত করা সব ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাই প্রধান। অথচ পরিবারে যেমন তার শ্রমের স্বীকৃতি নেই তেমনি নারী যখন কৃষিসহ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক হিসাবে যায় তখনও তাকে মজুরি বৈষম্যের শিকার হতে হয়। চা শিল্পের নারী শ্রমিকের অবস্থাও তাই। জবরদস্তিমূলক এ সমাজে শ্রমশোষণের হাত থেকে যেমন নারীর রেহাই নেই, তেমনি পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার নিপীড়ন থেকেও কোনো স্তরের নারীর রেহাই নেই।

নারীর অপমান সমগ্র সমাজের অপমান। নারী নির্যাতনের যত ঘটনা আজকাল ঘটছে তার যে-কোনো একটি ঘটনাই সমাজের ভিত কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। আর প্রতি মুহূর্তে নারী নির্যাতনের যেসব নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে চলেছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে সমাজের কর্ণধারদের নৈতিকতা জমকালো ভদ্রবেশের আড়ালে কিভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে। এসকল ভদ্রবেশী সমাজপতিদের এহেন সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতার মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়িতে সত্যিই করুণার উদ্রেক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ইতিহাসের খুব স্বল্পতম সময়ে হলেও নারীরা প্রকৃত মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছিলেন। সেটি হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ -

যেখানে নারীরা সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। নির্বিঘ্নে গভীর সমুদ্রযানের নাবিক থেকে মহাকাশের নভোচারী হয়েছিলেন। সমাজতন্ত্র নারীর অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে অবমুক্ত করে বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। তাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ-বৈষম্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের পথই নারীমুক্তির একমাত্র পথ। সেই পথের অভিযাত্রী হয়ে সংগ্রামী নারীদের কাফেলা নারীমুক্তির আরাধ্য স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে এগিয়ে আসবে। সমাজের সকল বঞ্চিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের মাঝেই নারী তার মুক্তির পথ মিলিয়ে দেবে। এ পথেই নারী আন্দোলন এগিয়ে যাবে। এদেশে নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার আক্রমণ ও চক্রান্ত প্রতিহতের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র কাজ করে যাচ্ছে। মহিয়সী বেগম রোকেয়া এবং বীরকন্যা প্রীতিলতার চেতনা ধারণ করে নারীজাগৃতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের পতাকাতলে সমবেত হোন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আওয়াজ তুলুন – **শোষণমুক্তির চেতনায় জেগে ওঠো নারী।**

দাবীনামা

- সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইউনিফরম সিভিল কোড চালু করতে হবে। সিডও সনদের পূর্ণ স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ঘরে-বাইরে নারী নির্যাতন, নারী হত্যা, নারী ও শিশু পাচার, ধর্ষণ, ফতোয়া, যৌতুক, উত্ত্যক্তকরণসহ সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।
- অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা বন্ধ করতে হবে। পর্নো পত্রিকা, ব্লু-ফিল্ম, মোবাইল ফোনে পর্নোছবি ডাইনলোড, মাদক ও জুয়া বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে নারীসমাজকে রক্ষার জন্য গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।
- মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা, ফতোয়াবাজ এবং ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।
- নারীদের পারিবারিক ও গৃহস্থালি কাজকে উৎপাদনশীল শ্রম হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এই শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।
- গার্মেন্টসহ সকল শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮০০০ টাকা ঘোষণা করতে হবে। সকল শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও আইডি কার্ড প্রদান করতে হবে। গৃহশ্রমিকসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের

নারী শ্রমিকদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

- শ্রমজীবী-কর্মজীবী নারীদের জন্য ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর করতে হবে। শ্রমজীবী-কর্মজীবী নারীদের শিশু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারি উদ্যোগে "শিশুযত্ন কেন্দ্র" চালু করতে হবে। কর্মস্থলে স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমঘন এলাকায় শ্রমজীবী-কর্মজীবী নারীদের জন্য সরকারী উদ্যোগে হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে।
- নারীশিক্ষাকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ করতে হবে। গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া নারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য খেলাধুলা ও আত্মরক্ষামূলক শরীরচর্চা আবশ্যিক করতে হবে।
- গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের ভিজিডি-ভিজিএফ কার্ড প্রদান, মাতৃত্বকালীন ভাতা কার্ড, বার্ধক্য ভাতা কার্ড, বিধবা ভাতা কার্ড প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
- আদিবাসী ও ক্ষুদ্রজাতিসত্তার নারীদের উপর সকল প্রকার নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে।
- উপজেলা পর্যায়ে মাতৃসদনের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ করতে হবে। প্রসূতি মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। নার্সদের ন্যায্য দাবি মানতে হবে।
- মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারীদের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করতে হবে। যুদ্ধাহত নারীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ফাঁসির রায় কার্যকর করতে হবে।
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধ করতে হবে। গাড়ি ভাড়া, বাড়ি ভাড়াসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-কয়লাসহ জাতীয় সম্পদ রক্ষা করতে হবে। রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করতে হবে।

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র

কেন্দ্রীয় কমিটি

Bangladesh Women's Liberation Centre

২২/১ তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৭৬৩৭৩, ই-মেইল: narimuktikendra@gmail.com

তারিখ : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪